Rs. 2.00
PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা
MONTHLY
মূল্য ঃ ২ টাকা
মাসিক
Vol : XV Issue : VIII, 15th November, 2025. ২৮শে কার্তিক, ১৪৩২, বার্ষিক মূল্য- ২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

নভেম্বর বিপ্লব ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লব রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত হলেও এর প্রভাব রাশিয়াতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই বিপ্লব যে নতুন সমাজব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে, তা সারা বিশ্ব পরিস্থিতেকে প্রভাবিত করেছে। এই নতুন সমাজব্যবস্থাই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, যা এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এমন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে না থাকবে শোষণ, জুলুম, বেকারী, দারিদ্র্য, অত্যাচার, সে সমাজ হবে শ্রেণীহীন, যে সমাজে প্রত্যেকের কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই নভেম্বর বিপ্লবের চরিত্র হচ্ছে আন্তর্জাতিক। এই বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হয়ছে মার্কস এঙ্গেলস ও লেনিনের নাম। কারণ, মার্কস এঙ্গেলসের চিন্তাধারাকে রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতিতে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে মহান লেনিন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নভেম্বর বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে। নভেম্বর বিপ্লব পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলো ১৯১৭ সালে। মানবতার প্রতিক ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন তার অনেক আগেই ১৯১৪ সালে লিখিত তাঁর বিখ্যাত বই "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়"- এ ঘোষণা করেছিলেন, যে এই স্তরই হচ্ছে পুঁজিবাদের শেষ স্তর, দেশে দেশে সামাজিক বিল্পবের শুরুর স্তর। সাম্রাজ্যবাদের স্তর হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধের প্রবণতার স্তর।

নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ প্রজ্বলিত শিখার ন্যায় দেবীপ্যমান। বিশেষ করে এই ভয়াবহ ও হিংস্র সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের পর্বে নভেম্বর বিল্পবের আদর্শই হতে পারে মেহনতী মানুষের দিশারী। সাম্রাজ্যবাদের এই ভয়াল রুপ, সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত বিশ্বায়নের এই নিষ্ঠুর ও হিংস্র রুপে সর্বাপেক্ষা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সমাজ, যুবক-সহ দিনমজুর, গরিব জনগণ।

অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করেছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র। আজ ইজরায়েল আর গাজার ভূখণ্ড দেখলেই বোঝা যাবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যদি বিশ্বের অগণিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষকে জয়ী হতে হয়, তাহলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপকে জনগণের সামনে উন্মোচিত করে দিতে হবে। এই দায় আমাদের সবার।

Vol : XV Issue : VIII, 15th November, 2025. PRABINBARTA Postal Regd. No.- KOL RMS/449/2025-27

"ফাইব্রোমায়ালজিয়ার আকুপাংচার চিকিৎসা"

ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত (9883120761)

ধরুন বেশ কিছু দিন ধরে আপনার সারা শরীরে ব্যাথা আর যন্ত্রণা হচ্ছে, ভালো করে ঘুম হচ্ছে না, সারা দিন ক্লান্ত লাগছে, ঘুম থেকে উঠেও মনে হচ্ছে শরীর পরিশ্রান্ত, কাজের কথা মনে রাখতে পারছেন না, ঠিকঠাক মতো চিন্তা ভাবনা করতে বা মনঃসংযোগ করতে পারছেন না। আপনি নিজে থেকেই বা ডাক্তার-এর পরামর্শে হরেক রকম পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু কিছু ধরা পড়ছে না। রক্তে ইউরিক অ্যাসিড, গ্লুকোজ, আর এ ফ্যাক্টর, সবই ঠিক আছে। আশেপাশে লোকজন ফিসফাস করছে... "কিস্যু হয়নি কাজে ফাঁকি দেওয়ার ফিকির"! আর নিকট জনেরা প্রকাশ্যে বলছে "বাতিক, বাতিক"!!!

কিন্তু সত্যিই কি তাই? উঁহু মোটেই না। এই রকম সমস্যাগুলো যে রোগটির লক্ষন, সেটির নাম- 'ফাইব্রোমায়ালজিয়া'।

কি থেকে হয় এই রোগটা? না, আধুনিক বিজ্ঞানীরাও এখনো ঠিকঠাক ভাবে সেই মেকানিজম-টা খুঁজে পাননি। তবে দেখা গেছে রক্তে পি সাবস্টেন্ট-এর বৃদ্ধি আর সেরোটোনিন-এর ঘাটতি হলে এই রোগটি হবার সম্ভাবনা খুব 'বেড়ে যায়। আসলে রক্তে এই দু'টি উপাদান-এর মাত্রা গোলমেলে হলে মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ড ব্যথার অনুভূতিকে ঠিক মতো বিশ্লেষণ করতে পারেনা। মানে সোজা কথায় ডাটা অ্যানলিসিসে গণ্ডগোল হয়ে যায়। আর তার ফলে শরীর-এর অনেক জায়গা ব্যথার প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে যায়। অন্যদিকে গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা, মনে রাখার ক্ষমতা, ঘুম, এগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অনেক সময় মাথার যন্ত্রণা, সারা শরীর শক্ত হয়ে যাওয়া, পেটের গোলমাল এসবও হয়ে থাকে। সাধারনত ল্যাব টেস্টে ফাইব্রোমায়ালজিয়া ধরা পড়েনা। রোগের লক্ষন দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে কোনো কোনো ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা বা সিটি স্ক্যান করার পরামর্শ দেন।

আমাদের অর্থাৎ আকুপাংচার চিকিৎসকদের কাছে অনেক রোগী বন্ধু মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করেন- "আকুপাংচার চিকিৎসা করে কি ফাইব্রোমায়ালজিয়ার কষ্ট কমানো যায়"? উত্তরটা হচ্ছে হ্যাঁ। কমানো যায়। রক্তে পি-সাবস্টেন্স কমানো আর সেরোটোনিন-এর মাত্রা বাড়ানো, এই লক্ষে আকুপাংচার করা হয়।

সেরোটোনিন হচ্ছে একটা নিউরোট্রান্সমিটার। এটি ঘুম, মুড, ব্যথা ও যৌন আচরণ ঠিক ঠিক রাখতে সাহায্য করে। আকুপাংচার-এর সাহায্যে এই সেরোটোনিন-কে রক্তে সঠিক মাত্রায় নিয়ে আসা সম্ভব। আকুপাংচার চিকিৎসায় খুব সূক্ষ্ম কয়েকটা সুচ শরীরের চামড়ার ওপর ফোটানো হয়। চামড়ার ঠিক নীচে থাকে প্রান্তীয় স্নায়ু। সুচগুলো ঐসব স্নায়ুকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে শরীর-এর ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনে। কখনো-সখনো ঐ সুচগুলোর সাথে মৃদু মাত্রার ইলেক্ট্রিক স্টিমুলেশনও যোগ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে সেভেন স্টার হ্যামার দিয়ে হ্যামারিং বা মক্সা (একরকম পাহাড়ি ভেষজ) চুরুটের গরম সেঁকও দেওয়া হয়।

আকুপাংচার চিকিৎসায় শরীরের সামগ্রিক ভারসাম্য ঠিকঠাক রাখার মাধ্যমেই ফাইব্রোমায়ালজিয়ার লক্ষনগুলো কমানো যায়। ফলে দীর্ঘদিন এর ব্যথা, যন্ত্রণা, অনিদ্রা, ক্লান্তি এইসব লক্ষন ধীরে ধীরে কমে যায়।

বিদ্যাসাগরের জন্মের দুই শত বছর পরেও হিন্দু নারীর বৈধ্যব্য কি ঘুচেছে

তপন কুমার দাস

স্ত্রী মারা গেলে বিপত্নীক, আর স্বামী মারা গেলে বিধবা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু দুই জনের অবস্থান আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এখনও।

সংস্কার বিশেষ করে ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষের মনের এক গভীর অন্ধকার স্থান। ক্ষতিকর জেনেও অনুসরণ করা, মুখে 'ও সব অর্থ হয় না' বলেও অনুসরণ করা, আর বিশ্বাস করে তো অনুসরণ করাই হয়। বিবাহের সময় পত্নীর শাখা-সিঁদুর পরা সংস্কার, কুসংস্কার না ধর্ম ? স্বামী মারা যাবার পর বিধবা বানানো সংস্কার, কুসংস্কার না ধর্ম? আজওকি বিধবা বানানো চলছে না? কুমারী, বৌ আর বিধবা, নারী হিসাবে কি একই রকম ভাবে প্রতিভাত হয়? যুবক স্বামী, বিপত্নীক কি সমাজে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয় ? নিছক স্বামী বিয়োগ থেকে বিধবা হয়না। বিধবা বানায় ধর্ম, কুসংস্কার। তার বদল বড় শক্ত।

বিদ্যাসাগর বিধবার বিবাহের কথা বলতে গিয়ে প্রায় নিহত হতে গিয়েছিলেন। কেবল একটা পরিবর্তন আনতে চেয়ে কী অবস্থা হয়েছিল তাঁর। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বইটি প্রকাশ হয় ১৮৫৫ সনে। সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা দেখা দিতে থাকে। তৎকালীন অগ্রসর চিন্তার ধারক শোভাবাজারের মহারাজা রাধাকান্ত দেব বিরুদ্ধতায় অবতীর্ণ হন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখলেন-

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল/বিধবার বিয়ে হবে বাধিয়াছে গোল। সংবাদ প্রভাকর নিন্দার আশ্রয় নিলো। রীতিমতো অশালীন কথা প্রকাশ করতে লাগলো। শান্তিপুরের তাঁতীরা সমর্থনে এগিয়ে এসে শাড়ির পারে লিখলেন, সুখে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে। অমনি পাল্টা কথা আসতে দেরি হলো না, লেখা হলো, শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে। সংস্কার-অন্ধ ভারতবাসীর মুখের সামনে উপনিবেশবাদী ইংরাজ বিধবা-বিবাহ আইন করলো।

১৮৫৬ সনে আইনসম্মত বিধবা বিবাহ হলো শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে কালীমাতা দেবীর। কিন্তু এই বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়েও এলেন না রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। বিদ্যাসাগরকে এক ঘরে করা হলো। রাস্তাঘাটে কটু কথা, অশ্লীল বাক্য, গালাগালি আরম্ভ হলো। জীবন সংশয় হয়ে উঠলো। ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রাম থেকে লেঠেল শ্রীমন্তকে পাঠালেন। রক্ষী বানিয়ে। তাঁকে হত্যার চেষ্টাও হতে লাগলো। ঠনঠনের কাছে একদিন আক্রান্ত হলে শ্রীমন্ত তাঁকে রক্ষা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষাকে 'আমাদের মূলধন' বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সূর্যমুখীর মুখে বলেছেন, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতার কে এক বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার বিধবা-বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন, যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে ?'

সংস্কারমুক্ত হয়ে মুক্তচোখে দেখা তাই বড়ই কঠিন। হিন্দুর বিধবা-বিবাহ এখন হয়। কিন্তু তা কি স্বাভাবিক ঘটনা। কথা উঠবে, সন্তানদের নিয়ে একলা থাকতে পারল না? সন্তান বলবে, বাবা বিয়ে করতে পারে, মা তাই বলে কেন বিয়ে করবে? প্রতিবেশী বা আত্মীয় বলবে, বিধবা হলে কি হবে, কদিন পরই দেখিস ও বিয়ে করে বসে আছে। এমন কথা ও মনোভাব হামেশাই দেখা যায়। আর পরিবারে অনুষ্ঠান হলে নিমন্ত্রিত হয়ে শুনতে হয়, কেবল অনুষ্ঠানে না গেলেই হল। আর সব তো বাধা নেই। মন্তব্য হামেশাই হয়, ও বাবা, দেখেছিস বিধবা হয়েও কেমন লাল শাড়ি পড়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। বলবে, বিধবার সাজগোজ দেখ। একটু লজ্জাও হয় না। এই সমাজ রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো মুক্তমন মানুষের দেখা পেয়েছে দুই শত বছর আগে। কিন্তু এখনও নাগরিক সমাজ হতে পারল না। নারী, পুরুষ সকল ব্যক্তিকে সমান মর্যাদায় দেখার দৃষ্টি লাভ করল না !

দুই আদার ব্যাপারী

জি এম আবুবকর

বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ মুঠোফোন জেগে উঠলো। কণ্ঠস্বরে মালুম হলো কে তলব করেছে। জিজ্ঞেস করলাম-কী খবর?

অপরপ্রান্ত থেকে খোঁচা-ফোন করেছিলে কেন? কী প্রয়োজন?

-ফোন! আমি! কই না তো!

-বলো কী!

-আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, তোমাকে আমি ফোন করিনি।

-তুমি বুকে হাত দিতেও পারো, না-ও পারো। কারণ, আমি এতদূর থেকে দেখতে পাচ্ছিনে। তবে আমার হাতের যন্ত্রটায় রেকর্ড হয়ে গেছে, আজ সকাল ১১টা ৪৭ মিনিট ১২ সেকেন্ড থেকে ১১টা ৪৮ মিনিট ২ সেকেন্ড পর্যন্ত তোমার ক্ষুদ্রযন্ত্রে আমাকে খুঁচিয়েছ।

-দেখ, মাত্র পঞ্চাশ সেকেন্ডের মোকদ্দমা, তোমার হিসেব মতো। আমি এরজন্য লড়তে রাজি নই। পুলিশরা কখনও সখনও নিরীহ লোককে বেদম পেটায় স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। পরে ললাটের দুর্ভোগ শেষ হলে হয়তো শেষপর্যন্ত আদালতে প্রমাণ হয় লোকটা বেকসুর। পুলিশের পেটুনি আর জেল-ভোগ লোকটার কপালে জোটে ফাউ। যন্ত্রে এত যন্ত্রণা জানলে ঘোড়ার ল্যাজ এটা আমি সাধ করে কিনতাম না।

—আমি ও যন্ত্রজ্বালায় অতিষ্ঠ। যাক, বলো আর কী ব্যাপার? কোনও কথা নেই তাহলে?

—কোনও ব্যাপার নেই। কিন্তু কথা আছে। এখনই একটা ব্যাপার তৈরি হতে পারে।

—বলছি, তোমার অ্যানড্রয়েড ফোনটা নিয়ে কেউ, মানে বাড়ির কেউ কি ঘাঁটাঘাঁটি করে? তুমি তো এখনও ফোন ব্যবহারে সাবালক হয়ে ওঠোনি বলে মনে হয়। অজান্তে বা না-বুঝে কল করে ফেলেছ হয়তো।

আমি আমতা-আমতা করে জানাই- তা মাঝেমাঝে বাড়ির লোক এজমালি সম্পত্তির মতো আমার ফোন নিয়ে হয়তো ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকতে পারে বৈকি!

—সেকি। প্রাইভেসি বলে কথা। তুমি অ্যালাউ কর কেন? তোমার সঙ্গে কার কী কথা হচ্ছে, রসালাপ

হচ্ছে না গোপনালাপ হচ্ছে, সে সব বাড়ির অন্য লোক কেনো জানবে?

আমি বললাম, আমি ফোনের মাধ্যমে কোনও অনাগত বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছি কিনা, সেটা বাড়ির লোক জানতে চাইলে কে আটকাবে? সেটা তো ডিফেনসিভ মেজারের পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া, রাইট টু ইনফরমেশন নামে একটা পারিবারিক রুল আছে আমাদের। বিপদে পড়লে কে ঠেকাবে? পরিবারের লোক, না কে? এই ধরো ফোনাফুনি করতে করতে একটা একস্ট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ারে ল্যাজেগোবরে হয়ে গেলাম। না জেনে, না বুঝে, কোনও দুষ্টচক্রের পাল্লায় পড়লাম। আগাম সাবধান করে দেওয়া বা সেখান থেকে ল্যাজ গুটিয়ে সরিয়ে আনার দায়িত্ব কার? পরিবারের তো!

–তুমি একটা কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন পাকালোক। নাবালক তো নও! কোনও ভুল করলে সেটা স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে করেছো। তার দায়িত্ব তোমার বটে। তোমার কারণে পরিবার নিয়ে টানাটানি হতেই পারে। চুল টানলে তো মাথা স্বাভাবিক ভাবেই আসবে। তবে ভাই, প্রাইভেসি ইজ প্রাইভেসি। নো কমপ্রোমাইজ, আমি বুঝি। সুপ্রিমকোর্টে পর্যন্ত প্রাইভেসি নিয়ে লড়াই চলছে। সংবিধানেও প্রাইভেসির স্বীকৃতি আছে, নিশ্চয় জানো, মানো।

–শোনো, আমার এক ইউনিভার্সিটি পড়া বান্ধবীর প্রণয়-বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন স্বয়ং তারই পিতৃদেব। স্পাই লাগিয়ে আগাম সব জানতে পেরে। বান্ধবীর অন্যথা, দুসরা পাত্রের সঙ্গে শেষপর্যন্ত সাতপাকে বন্দিত্ব ঘটে। কন্যার কাছে যেটা প্রেমসাগর, পিতার কাছে সেটা মান-সম্মানহানির অন্ধাগলি। মানে, বিপদের অকূল দরিয়া।

–এসব আজকাল আকছার ঘটে, ঘটবে, ঘটেছিল পাস্টে, প্রেজেন্টে, ফিউচারে বলে লাভ নেই। স্পাইবৃত্তি বড় বৃত্তি যদি না পড়ে ধরা! ধরা পড়লে বেধড়ক পিটুনি, হাড়হিম যন্ত্রণা, কিম্বা মৃত্যুদণ্ড। অথচ দেখো, এক দেশে যে স্পাই, স্বদেশে তার মূল্য স্বাধীনতা প্রেমিকের। অঘটন ঘটলে বীর বা বীরাঙ্গনার মর্যাদা কপালে জুটে যেতে পারে। আবার কপাল খারাপ হলে স্বদেশ তাকে তাদের নাগরিক নয় বলে ঘোষণা করতে পারে। স্পাইয়ের নাম কখনও টিকটিকি, কখনও বিদেশী গুপ্তচর-জানো তো। কোন দেশ না পোষে স্পাই? স্পাই শুধু এযুগে নয়, অতীতকালেও ছিল। দেশরক্ষার নামে বিদেশী শত্রুদের আটকাতে কত ষড়যন্ত্র ছলাকলা রচনা করা হয়। আধুনিক যুগেও তাই প্রত্যেক দেশে আছে এসপায়োনেজ। সুন্দরী নর্মসহচরী মাতাহারির গল্প নিশ্চয় শুনেছ। মন-ভোলানিয়া, দেহ-জুড়ানিয়া, নৃত্যপটিয়সী মাতাহারির নামে একটা বিখ্যাত সিনেমাও হয়েছিল। সাহেবদের দেশে প্রোফুমো-ক্রিস্টিন কিলার কেলেঙ্কারির ফলে ম্যাকমিলান মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছিলো। হুঁ, হাঁ এই জানুয়ারি মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের শেষ নারী গুপ্তচর সরস্বতী রাজমণির জীবনাবসান হলো। পেপারে তাঁর ছবি বেবোলো, জাতীয় পতাকায় মোড়া তাঁর দেহাবশেষ। তাহলে গুপ্তচরবৃত্তি স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে রাজনৈতিক স্বাস্থ্যসম্মত মানতেই হবে।

–যাই বলো, এখন মানব স্পাইয়ের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন স্যাটেলাইট, ড্রোন, রোবট ব্যবহারের যুগ। কোনও দেশের কোনও কিছু আর গোপন থাকছে না। এক দেশের খবর অন্য দেশ সবই আগাম জানতে পারে।

–আরে না না, এখন ধনসম্পত্তি, সমরাস্ত্র সম্ভারের পরিমাণ শক্তিমান দেশগুলি বুক ফুলিয়ে ডিক্লেয়ার করে। কারও কেয়ার করে না। এমনকী কোন রাষ্ট্রনেতা কোন নারীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছে সব প্রকাশ হয়ে পড়ে। আরে সংবাদপত্রের রিপোটাররাই তো স্পাইয়ের ভূমিকা পালন করছে। স্কুপ নিউজের কাঙাল রিপোটাররা। তা নাহলে দেশী-বিদেশী শক্তিশালী লোকগুলোর অপকর্মের খবর কী করে জানাজানি হয়ে হাট হয়ে প্রকাশ পায়।

এমনকী, নিশিকালে কার অন্দরমহলে কে ঢুকছে সে চিত্রও আজকাল অ্যাভেলেবল।

—হয় কী করে? ট্যাবলয়েড/পত্রিকা এত খোরাক পায় কোথায়?

—তেমন সফটওয়ার তৈরি হয়েছে শোনা যাচ্ছে, যা থেকে সব গোপন রহস্য পাবলিকের কাছে ওপেন হয়ে যাবে।

—যাক ছাড়ো। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কী দরকার? বলছি, বইমেলায় যাচ্ছ? কবে যাচ্ছ, কখন যাচ্ছ, কোথায় থাকবে, জানলে দেখা হতে পারে।

—না ব্রাদার, আমি বইমেলায় যাব না।

—কারণটা জানতে পারি?

—বইমেলায় গিয়ে লোভ সামলাতে পারব না। বই কিনে ফেলি প্রয়োজনের, অপ্রয়োজনের। কোনও মানে হয় না।

—ভালো তো। বইমেলা তো বই কেনার জন্য। আর বই তো পড়ার জন্য।

—ধুস্। কিনে রাখবো কোথায়? জায়গা নেই। যেগুলো আছে সেগুলোই ত্যাগ করার তালে আছি। বহু বই বয়সের কারণে পাঁপড় ভাজার মতো অবস্থা। সভ্য ভাষায় বললে ব্রিল্। ওজনদরেও বিক্রি হবে না। পুরনো কাগজ ক্রেতারা বলে এ কাগজে ঠোঙা করা যায় না। যাক গে।

—তুমি তো দেখছি ভারি দু-মুখো লোক। একদিকে বই-বিদ্রোহী, অন্যদিকে বই-লোভী, আশ্চর্য। বুক ইজ নলেজ, নলেজ ইজ পাওয়ার এসব কথা ভুলে গেছ?

—ছাড়ো, ছাড়ো, বইয়ের দিন শেষ। খোঁজ নিয়ে দেখ, (ওই-ত্রিদিব চ্যাটার্জির কাছে বইয়ের বিক্রি কমে গেছে। যুগ বদলে গেছে। এবার বইয়ের ব্যবসা উঠে যাবে)। বইমেলা উঠে যাবে ভাই।

—কেন বল তো?

—কারণ, মানুষ এখনই-মোবাইলে বই পড়ে। খবরের কাগজও তুমি মোবাইলে পড়ে নিতে পারো। এক-আঙুলে একটা পেন ড্রাইভে রাজ্যের তথ্য ঢুকিয়ে রাখা যায়। এখন ইন্টারনেটের জগৎ যাকে বলে, অন্তর্জাল।

—না, ওটা ভুল বাংলা। অন্তর্জাল হলো ইন্ট্রা-নেট। ইন্টারনেটের ভালো বাংলা আছে কিনা খোঁজ লাগাতে হবে। বরং ছোট্ট করে বলো নেট। গুগুল সার্চ করলে হেন তথ্য নেই যে, পাওয়া যায় না। দুনিয়া বদল রহা হ্যায় জি!

—তবে বইয়ের দিন শেষ হবে না অত সহজে দাদা। বই হার মানবে না। বই নিয়ে বাণিজ্য সারা পৃথিবীব্যাপী। কোটি কোটি টাকা, কোটি কোটি ডলার খাটছে বই-ব্যবসায়। কোটি মানুষের রুটিরুজি বইয়ের দৌলতে। আমি বলি, বইও চলবে, নতুন প্রযুক্তিও চলবে, সাইমলটেনিয়াসলি। তবে বই কমতির দিকে, নতুন প্রযুক্তি বাড়তির দিকে। এইটুকু বলা যায়। এখন চলছে ট্রানজিশন পিরিয়ড। এই ট্রানজিশনটা বিশ বছরে হতে পারে, পঞ্চাশ বছরেও হতে পারে ।

—দেখ, বই ব্যবসা বন্ধ হওয়া উচিত। বইয়ের পাতা তৈরি করতে গেলে লাগে গাছ। যত বই জন্ম নেবে তত গাছের মৃত্যু হবে। সবুজায়ন সবুজায়ন করে চেঁচালে হবে?

—গাছ কেটে একশা করছো এদিকে, তার বেলায় হুঁশ নেই। এত গাছকাটার ফলে পল্যুশন বাড়ছে। দূষণ দূষণ করে চিল্লালে হবে? কত মানুষ দুষণের জন্য মরছে, সাফার করছে, খোজ রাখো। প্রদূষণের ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে। তার ফলশ্রুতিতে মেরুপ্রদেশের বরফ গলছে, সমুদ্রের জল বাড়ছে। সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। নেট ফল, লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কত মানুষ গৃহহারা হবে ভাবতে পারছ?

—দেখ, আসল পল্যুশন সৃষ্টিকারী ধনী দেশগুলো। তারা নিউক্লিয়ার বর্জ্যের স্রষ্টা। পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাচ্ছে তারাই, সেদিকে কারও হুঁশ নেই। ওরা

শত শত স্যাটেলাইট ওড়াচ্ছে। সেগুলোর মৃত্যু হলে তার বর্জ্যগুলো মহাশূন্যেই থেকে যাচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদূষণে ভরে যাচ্ছে। বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ এ প্রশ্ন তুলতে হবে।

–ব্রাদার, আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের কী কাজ? আমাদের আয়ুষকাল বড়জোর দশ-কুড়ি বা তিরিশ বছর। যে যতটা টেকসই থাকবে, ততটা মাত্র।

–তাই বললে হবে! বলো, 'যতক্ষন দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে সরাব পৃথিবীর জঞ্জাল। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

অপরূপ ডারিংবাড়ি

সমীর কুমার ঘোষ

১১ই জানুয়ারি, ২০১৭ আমার সহকর্মী অপূর্ব সিকদারের উদ্যোগে চলেছি উড়িষ্যার সম্বলপুরে। এখানে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ও হীরাকুদ বাঁধ দেখে যাব ডারিংবাড়ি, তপ্তপানি পরিশেষে গোপালপুর হয়ে ফিরবো। যথাসময় হাওড়া ষ্টেশন থেকে সম্বলপুর এক্সপ্রেস দৌড় শুরু করলেও সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না নেংটির উপদ্রবে। বেপরোয়া নেংটির দল আমার সীটের আশপাশে ঘুরঘুর করছে। সুযোগ পেলে গায়ে উঠে আসছে। শুভ যাত্রায় মহাবিপত্তি। পরে জানা গেল আমার সীটের বিপরীতে যিনি বসে আছেন তিনি গণপতি বাপ্পার একনিষ্ঠ ভক্ত, সঙ্গে করে এনেছেন চিরে ভাজা, বাদাম, মুড়ি ইত্যাদি আমি চোখ বন্ধ করলেই ওই সব খাবার কামরায় ছড়াচ্ছেন, ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। ঘটনাটা জানার পর বিরক্তি প্রকাশ করায় মুখরোচক খাবার ছড়ানো বন্ধ হয়, কিন্তু ততক্ষণে সূর্যদেব পূব-আকাশে প্রকাশ পাবার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। নেংটির উপদ্রবও একটু কমেছে।

সকাল ৮.৩০টায় ট্রেন থেকে সম্বলপুর ষ্টেশনে নামতেই অপূর্বর ভাই ভোলার পূর্বনির্দেশ মতো দুটো গাড়ি এসে হাজির। গাড়িতে উঠতেই নির্দেশ এলো প্রথমে হোটেলে চলো তারপর প্রোগ্রাম ঠিক করে বেরিয়ে পড়া যাবে। নির্দেশমতো হোটেলে পৌছে স্নান, প্রাতঃরাশ সেরে আমি, অপূর্ব আর টুয়া একটা গাড়িতে উঠে পড়লাম। আর একটা গাড়ি রয়েগেল, ভোলার জন্য। ভোলা অ্যাটেন্ড করবে অফিস মিটিং-এ। এতোক্ষণ বলা হয়নি ভোলা কর্মসূত্রে ভারত পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে যুক্ত। এবং উচ্চপদে আসীন। কর্মসূত্রে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে হামেশাই ট্যুরে যেতে হয় তাই, কোথাথেকে কিভাবে গেলে দর্শনীয় স্থানগুলোয় সহজে পৌছান যাবে, সব ওর নখদর্পণে।

ঠিক হলো আমরা প্রথমে দেখতে যাব হীরাকুদ ড্যাম। হীরাকুদ নামটা শুনেই মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় ভূগোল বইয়ে পড়া কয়েকটা কথা। বিশ্বের দীর্ঘতম কৃত্রিম বাঁধ। মহানদীকে বশে আনতে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের কাজ শেষ হয় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে। হীরাকুদ ড্যাম প্রোজেক্টের কর্মকাণ্ড শুরু হয় ১৯৫৩ সালে, শেষ হয় ১৯৫৯ সালে। ফি বছর মহানদীর অভিশপ্ত বন্যা প্রতিরোধ ও খরা অঞ্চলের চাষ-বাস বাড়াতে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দিতে ১৯৫৭ সালে আমাদের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই বাঁধের উদ্বোধন করেন। সম্বলপুর শহর থেকে মাত্র ১৬ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে ছত্তিশগড় সীমান্তে হীরাকুদ একটি জীবনদায়নী প্রজেক্ট। অতীতে হীরা পাওয়া যেত এখানকার ছোট ছোট দ্বীপে। দ্বীপকে স্থানীয় ভাষায় বলে কুদ। হীরার দ্বীপ থেকেই হয়েছে

হীরাকুদ। হয়তো সে কারণে এক সময় সম্বলপুর হীরার ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো। আদিবাসী ঝারাদের বাস ছিলো বিভিন্ন কুদে। তবে, আজ আর তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে না, কারণ দিগন্ত বিস্তৃত জলধারাটি সবই গ্রাস করেছে। ৭৪৬ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত এই বিশাল জলাধারটি এশিয়ার বৃহত্তম বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। গান্ধী মিনার বা জওহর মিনার থেকে দেখলে মনে হবে এই আদিগন্ত জলরাশির শেষ সীমা যেন আকাশ ছুঁয়েছে। সে সময় ২৬.৭৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল ৪,৮০০ মিটার দীর্ঘ আর ৬০ মিটার বিশ্বের দীর্ঘতম বাঁধটি গড়তে। ৬৫টা স্লুইশ গেট রয়েছে নানাস্থানে সেচের কাজের জন্য। এই লেক থেকে জল যাচ্ছে ১,৩৩,০০০ বর্গ কি.মি. কৃষি জমিতে। আর বিদ্যুৎ প্রস্তুত হচ্ছে ১,২৩,০০০ কিলো ওয়াট যা রাউরকেল্লার স্টীল ফ্যাক্টরী ছাড়াও উড়িষ্যা রাজ্যের আরো বহু কলকারখানায় পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

প্রজেক্ট কলোনির সিকিউরিটি অফিস থেকে প্রবেশের অনুমতি সংগ্রহ করে বাঁধের দু-প্রান্তে দুই পাহাড় চূড়োর মিনারে উঠলাম। নয়ন মনোহর মরসুমি ফুলের বাগিচার মাঝে হীরাকুদ প্রান্তে ৮০ ধাপ সিঁড়ি চড়ে ঘূর্ণায়মান গান্ধী মিনার থেকে লেকের দৃশ্য ভারী সুন্দর। মিনার থেকে পাখি ওরা দূরত্বে ৫ কি.মি. দূরে দেখা যায় বাঁধের অপর প্রান্তে বারলায় আর এক পাহাড় চূড়ায় রয়েছে নেহেরু মিনার। ৯৪ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে জওহর মিনার থেকে মন মুগ্ধকর লেকের দৃশ্য অপূর্ব। মিনার লাগোয়া পাহাড় চূড়ায় অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকার জন্য রয়েছে অশোক যাত্রীনিবাস। এখানেও রয়েছে রঙীন ফুলের বাগিচা, ফুলে ফুলে সেজে উঠেছে নিবাস সংলগ্ন প্রাঙ্গনটি। বাঁধের এই পথটুকু সাধারণ যাত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ। এক মিনার থেকে অপর মিনারে যেতে সড়ক পথে অতিক্রম করতে হয়েছে প্রায় ১৫ কি.মি. পথ। গান্ধী মিনারের ভিউ পয়েন্টটি ঘূর্ণায়মান হওয়ায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে সবদিক দেখে নেওয়া যায়। দুটি মিনারে চড়তে টিকিট লাগে ৫ টাকা করে।

হীরাকুদ কৃত্রিম লেক পরিদর্শনের পর লাঞ্চ সেরে আমরা রওনা হলাম ডেবরীগড় ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির উদ্দেশ্যে। এবার দলে যোগ দিলেন ভোলা ভাই, যার নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় এই মনোরম ভ্রমণ যাত্রা সার্থক হতে চলেছে। হীরাকুদ বাঁধের দক্ষিণ-পশ্চিম তীর ধরে প্রায় ২৫ কি.মি. পথ পারি দিয়ে বাঁধেরই আর এক প্রান্তে পাহাড়ের ঢালে ডেবরীগড় ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারী পৌঁছে ফরেস্ট রেঞ্জডে অফিস থেকে টিকিট সংগ্রহ করে আমরা জঙ্গলের পথ ধরলাম। এখানে জঙ্গল সাফারি গাড়ি থাকলেও জঙ্গল সাফারি ব্যবস্থাপনার অভাবে রেঞ্জ অফিসারের অনুমতি নিয়ে নিজেদের তত্ত্বাবধানে বন-বিহারে বেড়িয়ে পড়লাম। ৩৪৭ বর্গ কি.মি. জুড়ে বিস্তৃত গা ছম্ ছম্ করা বিশাল অভয়ারণ্যটি ভালভাবে ঘুরে দেখতে হলে একজন গাইডের বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু এখানে সে রকম ব্যবস্থা না থাকায় জঙ্গলের মাঝে প্রধান রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো। বড় বড় শাল গাছে ছাওয়া মিশ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের গহীন অরণ্যে চিতাবাগ, স্লথ বিয়ার, শম্বর, গাউর, নীলগাই, বন্য শুয়োর, বন্য কুকুর, মাউস হরিণ, চিতল হরিণ ইত্যাদি প্রায় ৪০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাস ডেবরীগড় অভয়ারণ্যে। তেমনই প্রায় ২৩৪ প্রজাতির পরিচিত, অপরিচিত পাখিদের স্বর্গরাজ্য এই বিশাল বনভূমি। এছাড়া রয়েছে ৪০ প্রজাতির সরীসৃপ যার মধ্যে দেখা পেলাম কয়েকটি গিরগিটি ও গোসাপের। পথ চলতে চলতে শুনতে পাচ্ছি পাখিদের কল-কলানি। গাড়ি থেকে নেমে তাদের দেখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম কারণ তারা আশ্রয় নিয়েছে গাছের মগ ডালে শুধু ভেসে আসছে তাদের মধুর কলতান। পথে দেখা পেলাম কয়েকটি ময়ূরের, তারা সন্তর্পণে রাস্তা পেরিয়ে প্রবেশ করলো গভীর ঝোপে। অভয়ারণ্যটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে হীরাকুদ বাঁধ, সে কারণে জলের ধারে দেখা মিললো কয়েক রকম বক, পানকৌড়ি, বনমোরগ, তিতির, মাছরাঙা, ফিঙে, এরকম বেশ কিছু পরিচিত পাখির। বিকালের দিকে ফেরার সময় পথরোধ করে দাঁড়ালো একদল গাউর দলপতি শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে আমাদের দিকে

তীক্ষ্ণ নজর রেখে দলকে পথ পার করে পাঠিয়ে দিলো হ্রদের দিকে। ওরা চলে যেতে লেকের ধারে দেখলাম আরও কয়েকটা গাউরের দল এসেছে কচি ঘাস-পাতা খেতে। তবে প্রত্যেকটি দলের দলপতিরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছে আমাদের চলাফেরার উপর। এবার দেখা পেলাম কয়েকটি চিতল হরিণ ও দুটি বন্য শূকরের। এভাবে ১৪/১৫ কি.মি. বনপথ পরিক্রমার পর সন্ধ্যা নেমে আসায় জঙ্গলের পথ পরিহার করে ফিরে আসি বাঁধের পথে সম্বলপুরের উদ্দেশ্যে। হীরাকুদের জলে তখন ফাগের খেলা চলছে, সূর্য্যাস্তের নরম আলোয় জল তখন লালে-লাল, সূর্য্যদেব ক্রমশঃ ঢলে পড়লো হীরাকুদের মাঝে।

রাত্রে ডিনারে ঠিক হলো আগামীকাল সকালে সামলেশ্বরী দেবীর দর্শন সেরে আমরা যাব দুমার বিখ্যাত হেলে থাকা মন্দিররাজি দর্শণে। সকাল ৮টা নাগাদ রওনা হয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌছে গেলাম ১৬ শতকের কোন এক সময় গড়া রাজা বলরাম দেব কর্তৃক কলিঙ্গ স্থাপত্যে গড়া সুউচ্চ মন্দিরটিতে। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামলাই (দুর্গা) অর্থাৎ ত্রীনয়নী দেবী সামলেশ্বরী। দেবী মুর্তিটি গ্রানাইট পাথরে নির্মিত। মূর্তির কাল্পনিক নাকে খাঁটি সোনার ঐতিহ্যবাহী সম্বলপুরি নাকের অলঙ্কার ঝুলছে। নবরাত্রি পূজায় দেবী একেক দিন একেক সাজে নবদুর্গা রূপে পূজিত হন। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় বেজা। শ্রী শ্রী সমলেশ্বরী, সম্বলপুরের অধিপতি দেবতা হওয়ায় এই শহরের নামকরণ দেবীর নাম থেকেই নেওয়া হয়েছে। শ্রী শ্রী জগন্নাথের পর তিনিই ওড়িশার একমাত্র দেবী যিনি সম্পূর্ণ পশ্চিম ওড়িশা, ঝাড়খন্ড এবং ছত্তিশগড়ের কিছু অংশ সহ এত বড় অঞ্চলের প্রধান দেবতা। প্রাচীন মন্দিরটি কারুকার্য মণ্ডিত, উচ্চতা ৬০/৭০ ফুট হবে। মন্দিরের চূড়া সোনার তৈরি। একটু তফাতে বয়ে চলেছে মহানদী। ভক্তেরা নদীতে চান করে মাকে পুজো দেন এতে মা প্রসন্ন হন এটাই বিশ্বাস।

সামলেশ্বরী দেবীমাকে প্রণাম জানিয়ে আমরা রওনা হলাম হুমার উদ্দেশ্যে। গাড়ি ছুটলো। ছুটলো প্রায় ২৩ কি.মি. সম্বলপুর শহরের দক্ষিণে মহানদীর তীরে। এসে পড়েছি হুমা গ্রামে, বোর্ডে লেখা 'Learing Temple of Huma'। হুমার মন্দির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই বলতে হয় এধরণের মন্দির মন্দিরময় ভারতবর্ষের একটি ব্যতিক্রমী মন্দির। হেলান মন্দির ভারতবর্ষে অতি বিরল এবং তা খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হলে অবশ্যই হুমাতে আসতেই হবে। সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম হলো পিসার হেলান টাওয়ার এযেনো তারই প্রতিরূপ। ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে নজিরবিহীন আশ্চর্যভাবে হেলে থাকা হুমার এই মন্দিরটি প্রস্তুত হয় সম্বলপুরের পঞ্চম চৌহান রাজা বলিয়ার (Baliar) সিং-এর রাজত্বকালে (১৬৬০-১৬৯০ খ্রিঃ)। কয়েকজন ঐতিহাসিক বলেন- গঙ্গা বংশীয় সম্রাট অনঙ্গভীম দেব তৃতীয় এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন এবং সম্বলপুরের পঞ্চম রাজা বলিয়ার সিং দ্বারা পুর্ননির্মাণ বা সংস্কার করা হয়েছিল। এছাড়া মন্দিরের হেলান তোরণ দ্বারটি নির্মাণ করেন বলিয়ার সিং। বাকি মন্দিরগুলি সম্বলপুরের রাজা অজিত সিং-এর (১৭৬৬-৮৮খ্রিঃ) শাসনকালে নির্মিত-হয়েছিল। তোরণ দ্বার আর মূল মন্দিরটি ১৩.৮ ডিগ্রি হেলে রয়েছে প্রায় ৪০০ বছর ধরে। হেলে পড়ার সঠিক কারণ জানা না গেলেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন নির্মাণের সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এমন হতে পারে। আবার এও বলা হয় মহানদীর বন্যা বা ভূমিকম্পনের কারণে এমন হতে পারে। কেউ কেউ এও বলেন মন্দিরগুলি একটি পাথুরে স্তরের উপর গড়ে উঠেছে এবং নানান প্রাকৃতিক কারণে মাটির অভ্যন্তরের পাথরের স্থানচ্যুতির ফলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। মজার ব্যাপার মূল মন্দিরের চূড়াটি কিন্তু উঠেছে সিধে হয়ে। তবে, আশ্চর্যের বিষয় হলো মূল মন্দিরটি যে দিকে হেলে আছে সেখানে অন্যান্য মন্দিরগুলি হেলে আছে অন্যদিকে। মূল মন্দিরে ভগবান বিমলেশ্বর শিব। বিগ্রহও হেলান তবে ফুল, বেলপাতার আড়ালে ঠিক বোঝা গেল না। এটি একটি শৈবতীর্থ, তাই শিবরাত্রির উৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন বাবার মাথায়

জল ঢালতে। জলও পাওয়া যায় পাশেই বয়ে চলা মহানদীতে। মহানদীর মহা বাদে একটি শীর্ণকায়া নদী বলা চলে। বড় বড় পাথরের আড়ালে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে নদী। এরই জলে ঘাটের কাছে দেখা মেলে এক-দেড় কিলো সাইজের রঙ-বেরঙের 'কুডো' মাছ। খাবার দিলে ছুটে আসে, দেখা দেয়। জানুয়ারি থেকে জুন মাস অবধি এদের দেখা মেলে তারপর বর্ষায় এরা আশ্রয় নেয় পাথরের আড়ালে, সুড়ঙ্গে। শিবের চ্যালা এই মাছেদের স্থানীয়রা ধরেন না। বিশ্বাস কুডো মাছ ধরলে অভিশাপ লাগে। অভিশাপটা কার দেওয়া তা জানা যায়নি। ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে হাতে সময় থাকলে এঁকে বেঁকে বয়ে চলা মহানদীতে কিছুটা সময় নৌকাবিহার করা যেত। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়, আমাদের অনেকটা পথ পেরিয়ে যেত হবে ডারিংবাড়ি।

ভগবান বিমলেশ্বর শিব প্রসঙ্গে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তা হলো পুরাশলে একজন দুধওয়ালা নিয়মিত শিবের পুজো করতে মহানদী পার হয়ে তীরের কাছে একটি পাথরে তাঁর বয়ে আনা দুধ উৎসর্গ করতেন ভক্তিভরে। দুধ ঢালা মাত্রই পাথরটি তৎক্ষণাৎ তা গ্রাস করে নিত। এই অলৌকিক ঘটনা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে নানান দিকে। পরে রাজার কানে যেত তা পূর্ণতা পায় মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে।

হুমা থেকে ফুলবনি প্রায় ১৬০/৬৫ কি.মি.। রাস্তা ভারী সুন্দর, দু'পাশে বড় বড় গাছ, চওড়া রাস্তা। NH 15 ধরে চলেছে আমাদের দুটো গাড়ি। মাঝে পড়লো সোনব্রীজ যেন শেষ হতেই চায় না। এখন জল নেই, বর্ষায় ভয়ঙ্কর। NH 15 পর NH 57 তারপর NH 157 ধরে উড়িষ্যার উপজাতি অধ্যুষিত কন্ধমাল জেলার ফুলবনিতে এসে পৌছলাম ১২.৩০টা নাগাদ। কন্ধমাল জেলাটি ফুলবনি জেলা নামেও পরিচিত। ১৫০০ ফুট উচ্চতার ফুলবনি পৌছতে বাঁক খাওয়ানো পাহাড়ী রাস্তা ভারী রোমাঞ্চকর। পথের দু'পাশে শাল, সেগুন, কুরুম-এর জঙ্গল। দূরে সার সার তরঙ্গায়িত পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। ব্রহ্মপুর থেকে ফুলবনির দূরত্ব ১২৭ কি.মি.। পথ চলতে চলতে মনে হয় প্রকৃতি রানী যেন নিপুণ হস্তে একে সাজিয়েছেন। ফুলবনির মূল আকর্ষণ এর হাট, হাটবারে নানারকম রঙ-বেরঙের পোশাক পরে আদিবাসী রমণীরা আসেন হাট করতে। কন্ধমাল উড়িষ্যার পিছিয়ে থাকা একটি জেলা। এক সময় মাওবাদী উপদ্রবের কারণে সাধারণ যাত্রীরা এখানে আসতে চাইত না। তবে, এখন আর সে উপদ্রব নেই। শান্ত পরিবেশে, প্রকৃতির মাঝে কয়েকটি দিন কাটাতে এখন শহর থেকে আসছেন অনেকেই তাই পথের ধারে ছোট ছোট হোটেল হয়েছে বেশ কয়েকটি।

ফুলবনিতে চা-পানের ক্ষনিক বিরতি। ফুলবনি থেকে ১০৫ কি.মি. দূরে ডারিংবাড়ি, আমাদের গন্তব্যস্থল। বেধরপুর থেকে ১১৯ কি.মি.। গাড়ি ছুটছে মসৃণ রাস্তা ধরে, রাস্তার দু-পাশের দৃশ্য চোখ মেলে দেখছি, এক কথায় অপূর্ব, যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো। কোন শিল্পী যেন তাঁর নিপুণ হস্তে তুলির টানে মনকাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন ক্যানভাসে। দূরে পাহাড়ের সারি, পথের দু-পাশে শাল, সেগুন, জারুল আরও কতো কি গাছ উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পথ ক্রমশ উপর পানে উঠছে। ডারিংবাড়ির এক বা দেড় কি.মি. আগে রাস্তার দু-পাশে চোখে পড়ছে পাইনের সার। এর আগে এদিকে কোথাও পাইন গাছ নজরে আসেনি। এখানেই দেখলাম প্রথম পাইনের জঙ্গল। পাইন গাছের কাটি পাতার ফাঁকে পর পর পাহাড়ের সারি, মনে পড়ে যাচ্ছে গাড়োয়াল হিমালয়ের দৃশ্য। কিন্তু সেই অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠতে না উঠতেই শেষ হয়ে যায় পথ, ভাবতে পারিনি। আমরা পৌছে গেছি ডারিংবাড়ি। ডারিংবাড়ির উচ্চতা মাত্র ৩০০০ ফুট। বলা হয় উড়িষ্যার কাশ্মীর। পথের শোভা দেখে মেন হয়েছিলো ভূস্বর্গ কাশ্মীরের মনমুগ্ধকর দৃশ্যই বোধহয় চোখের সামনে ফুটে উঠবে। বিস্ময়ের ঘোর কাটলো লোকালয়ে প্রবেশ করে।

টিলা পাহাড়ের মাথা পরিষ্কার করে যত্রতত্র ঘর, বাড়ি, দোকান, হোটেল, রেস্তোঁরা, বাজার, বাসস্ট্যান্ড গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে স্কুল, কলেজ, চার্চ। শিক্ষার

বিস্তার কন্ধমাল জেলায় ঘটেছে অতি দ্রুত। দেখে খুব ভাল লাগলো। অবশ্য এসব ঘটেছে মিশনারিদের সহায়তায়। প্রতি গ্রামে স্কুল, বালক-বালিকা হোস্টেল, বাজার, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর প্রায় প্রতিটি গ্রামেই গড়ে উঠেছে সুদৃশ্য চার্চ। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না এই দুর্গম অঞ্চলের অবহেলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য সুদূর ইউরোপ থেকে খ্রীষ্টান পাদরী সাহেবরা কত ত্যাগ স্বীকার করে এখানে এসে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন, এদেরই মাঝে। সেলাম জানাই সেই সব মহা মানবদের। ব্রিটিশ শাসনকালে মিঃ ডারিং নামে এক সাহেব এই অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর নাম থেকেই এলাকাটির নামকরণ হয় ডারিংবাড়ি।

দেখতে দেখতে আমরা এসে পড়েছি ডারিংবাড়ি থানার সামনে। এদিকেও যথেষ্ট গাছ-পালা কেটে চলেছে শহর গড়ার উদ্যোগ। ভাল লাগছে না কারোরই, সবাই বিরক্তি প্রকাশ করছে, এই দেখতেই কি ডারিংবাড়ি আসা। নেট খুললে ডারিংবাড়ির যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তার সঙ্গে এই ডারিংবাড়ির কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। থানার বড়বাবু পূর্বপরিচিত হওয়ায় একজন কনস্টেবল সঙ্গে দিলেন আমাদের রাত্রিবাসের স্থানটি দেখিয়ে দিতে। বাজারের কাছে রাস্তার ধারের হোটেলে কচি পাঁঠার ঝোল, ভাত ইত্যাদি খেয়ে আমরা চলে এলাম ডারিংবাড়ি টাউনশিপের সামান্য দূরে নিরিবিলি, নির্জন, শাল-সেগুনের ছায়ায় গড়া ইকো হাউসে। এখানে পৌঁছে সকলের মনের বিষন্ন ভাবটা কাটলো। প্রকৃতিকে আবার কাছ থেকে পেলাম, যেন তারই মাঝে গড়ে উঠেছে ইকো হাউসটি। সারিবদ্ধ এক কামরা ঘরের সামনে ছোট ছোট ফুলের বাগান, ক্যাকটাস দিয়ে সাজানো। সামান্য নীচে রয়েছে আম গাছের বাগান। গাছে মুকুল এসেছে, এসেছে রঙীন প্রজাপিত ও মৌমাছির দল তারা নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে মধুর সন্ধানে। গাছে গাছে বুলবুলি শিস দিয়ে ডেকে চলেছে এক নাগারে। মনটা ভরে উঠলো আনন্দে। অপূর্ব পাশ থেকে বলে উঠলো এটাই হলো ডারিংবাড়ির সঠিক চিত্র।

সবে যখন ডারিংবাড়ির রূপ সুধা চাক্ষুষ করছি ঠিক তখনই ডাক এল চল নেচার পার্ক যেতে হবে। অগত্যা গাড়িতে চড়ে এক কিলোমিটার ফেলে আসা পথ ধরে পাহাড় টপে নেচার পার্কে পৌঁছে গেলাম কয়েক মিনিটের মধ্যে। পাইনের জঙ্গলের পাশে পার্কটা গড়ে উঠেছে। টিকিট কেটে পার্কে প্রবেশ করতেই চোখে পড়লো এখানে কি কি আছে তার বিবরণ যার মধ্যে আমাদের প্রথম আকর্ষণ করলো প্রজাপিত পার্ক। পার্ক-এর এ-অংশটাতে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, গাঁদা, জিনিয়া, পিটুনিয়া ইত্যাদি আরও অনেক রঙ-বেরঙের ফুলের গাছে বাগান সাজানো হয়েছে ঠিকই কিন্তু, প্রজাপিত কই? হয়তো এখন বিকেল তাই হয়তো তাদের দেখা পাওয়া গেল না। সকালের দিকে এরা ফুলে ফুলে বসে মধু পান করে। এরপর দেখলাম হার্বাল প্ল্যান্ট-এর প্রদর্শন। এখানে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন ঔষধি গাছ যা থেকে নানারকম ওষুধ প্রস্তুত হয় তারই কিছু নিদর্শন যেমন- আমলা, অশ্বগন্ধা, সর্পগন্ধা, অ্যালোভেরা, অ্যাসপেরাগাস, তুলসী, থাইম (Thyme), Lemonbalm ইত্যাদি। আরও কতো কি, সব নাম মনে নেই। এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আদিবাসী সমাজ জীবনের প্রদর্শন দেখতে। ফাইবার গ্লাসের অপূর্ব প্রমাণ সাইজের মূর্তিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নেচার পার্কের সামনেই রয়েছে Hill View Park সাজানো বাগান, শিশুদের জন্য নানারকম রাইড, সারাক্ষণ গান চলছে পার্কের সামনেই বিভিন্ন কোণায় বক্সের মাধ্যমে। ভিউ পয়েন্ট থেকে ডারিংবাড়িকে ভারী সুন্দর দেখায়। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি সুন্দরী ডারিংবাড়ির পানে। সঙ্গীদের ডাকে সম্বিৎ ফেরে, এবার ঘরে ফেরার পালা থুরি নেচার হাউসে।

পরদিন সকালে জানলাম এখানে নাকি কোনো কোনো বছর বরফ পড়ে। নেচার হাউসের কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলে বলেন গত ডিসেম্বরে বরফ পড়েছিল। বলি তোমরা কি কখনও তুষারপাত হওয়া দেখেছো- উত্তরে বলেন না। আরও বলেন বরফ পড়ে শুধু রাতের বেলা। কোথায় বরফ পড়েছিল জানতে চাইলে

বলেন ঐ ঘাসের উপর আর কোথাও নয়। ব্যাপারটা এ্যাতক্ষণে হৃদয়সঙ্গম হয়। শীতকালে সারারাত শিশির পড়ে ঘাসের উপর তারপর রাতের কোনো এক সময় তাপমাত্রার হেরফেরে তা পারদ শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াশে নেমে যায় সে সময় ঐ শিশির বিন্দু রূপান্তরিত হয় ফ্রস্টে। এরকম ঘটনা লোয়ার হিমালয়ে চলার পথে বহুবার দেখেছি। এটাকেই এঁরা বলছেন বরফ পড়া। আর সেই ছবি নেট মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। আমরা সমতলের মানুষ হুজুগে পাবিলক ছুটে যাই বরফ পড়া দেখতে। তবে বরফ দেখতে না পেলেও আরও অনেক কিছু দেখার আছে। গেলাম কফি চাষ দেখতে বড় বড় শাল, সেগুনের ছায়ায় বেড়ে উঠছে কফি গাছ। ছোট গাছ, লাল কফি ফলে ভরে গেছে সমস্ত ডালপালা। ফল পাকলে এর বীজ থেকে প্রস্তুত হবে মহার্ঘ কফি। রয়েছে গোলমরিচ গাছ কফি গাছের পাশে বড় বড় গাছকে জড়িয়ে ধরে বেড়ে চলেছে। এছাড়া এখানে জৈব প্রথায় চাষ হচ্ছে উন্নতমানের হলুদের যা ইতিমধ্যে জি আই ট্যাগ পেয়েছে। আদা চাষের জন্যও এ অঞ্চল খুব বিখ্যাত।

ডারিংবাড়ির চাষবাস দেখে গাড়ি ছুটলো লাভার্স পয়েন্ট বা ভিউ পেয়েন্টের উদ্দেশ্যে। মিনিট পনেরো গাড়ি ছোটার পর থামে ডারিংবাড়ির দক্ষিণে এক পাহাড়ের মাথায়। উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফেলে আসা ছোট্ট শহর, পথঘাট সবই দেখা যাচ্ছে পটে আঁকা ছবির মতো। আশপাশে কোনো ঘর-বাড়ি নেই পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে শুধুই জঙ্গল শাল, সেগুনের নয়, এদিককার পাহাড়ে লাগানো হয়েছে সারিবদ্ধভাবে শুধুই পাইন গাছ। এই পাইন গাছের আধিক্যের জন্যই কি ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে ডারিংবাড়ির সঙ্গে। এর সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। তবুও ফেরার সময় দূর থেকে ডারিংবাড়িকে দেখি বিষন্ন মনে, বিদায় জানিয়ে এগিয়ে যাই আরও ৭ কি.মি. দূরে ঝর্ণা দেখতে। রাস্তা কিছুটা নেমে পাথরের বেশ কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙ্গে মড়ুড়বান্দা বা মিদুবান্ধা জলপ্রপাতের দেখা পেলাম। একটি মনোরম পিকনিক স্পট। ঝর্ণায় প্রবল বেগে জল নামছে, আশপাশে পিকনিক হচ্ছে, থার্মোকল প্লেট আর প্লাস্টিক গেলাসে নোংরা হয়ে রয়েছে চারদিক, পরিবেশ দূষণ হচ্ছে ভীষণভাবে। সভ্যমানুষের অসভ্যতার চরম নিদর্শন পেয়ে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাই সুন্দরী ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্য্যও আমার মনকে টানতে পারে না। কয়েক মিনিট থেকে উঠে আসি পথের ধারে।

আবার পথ চলা। কন্ধমাল জেলার কত পাহাড়। কত জঙ্গল, কত গ্রাম, স্কুল, হোস্টেল, চার্চ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখতে দেখতে দুপুরে এসে পৌছলাম গন্ডোম জেলার সানাখেমুন্ডি ব্লকে অবস্থিত তপ্তপানিতে। ব্রহ্মপুর থেকে তপ্তপানি মাত্র ৯৯ কি.মি. আর ডারিংবাড়ি থেকে এর দূরত্ব ১১৬ কি.মি.। ১৪২১ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত তপ্তপানিতে রয়েছে সালফার মিশ্রিত গরম জলের কুন্ড। স্নানে চর্মরোগ সারে। 'তপ্তপানি' নামকরণ প্রসঙ্গে যেটুকু জানা যায় ওড়িয়া ভাষায় 'তপ্ত' মানে গরম আর 'পানি' অর্থাৎ জল। এই প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবনের জল ঔষধি গুণে ভরপুর এবং এটি পূর্ব ঘাটের পূর্ব ঢালের পাহাড় চূড়ায় সবুজ বনের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় এর পাশেই রয়েছে বনবিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে একটি হরিণ পার্ক। দেবী অধিষ্ঠিতা কান্ধী মূল কুন্ডে কুন্তে। পুজো দেওয়ার রীতি রয়েছে। উষ্ণ প্রস্রবনের জল পাইপ মারফৎ যাচ্ছে কাছেই পান্থনিবাসে। এখানেও গাড়ি বোঝাই পুণ্যার্থী আসছেন, রান্না করছেন, খাচ্ছেন আর যত্রতত্র থার্মোকল থালা, বাটি ও প্লাস্টিক গেলাস ফেলে রেখে চলে যাচ্ছেন। পরিবেশ দূষণ হচ্ছে ভয়ংকরভাবে। পরিবেশ সংক্রান্ত সরকারী বিধিনিষেধ কেউ মানছেন না। জানি না আমাদের দেশের মানুষ আর কবে পরিবেশ সচেতন হবেন! তপ্তপানির উষ্ণ জলে ঘন্টা খানেক অনায়াসে কাটানো যায় কারণ, জল উষ্ণ হলেও বেশী উষ্ণ নয় যেমন দেখেছিলাম পার্বতী ভ্যালির মনিকরণে- জল সারাক্ষণই ফুটছে এবং এ্যাতো গরম যে মন্দির চাতালে খালি পায়ে হাঁটা-চলা দুষ্কর, কাঠের পাটাতনের উপর চলতে ফিরতে হয়। জলে এক মিনিটের বেশি

পা ডোবান যায় না এ্যাতোটাই উষ্ণ। কুন্ড লাগোয়া চায়ের দোকানে চা, বিস্কুট খেয়ে আবার পথ চলা গন্তব্য গোপালপুর-অন-সী।

গোপালপুর সমুদ্রতটে এসে পৌছলাম বিকাল ৪.৩০টায়। সমুদ্রতটের রাস্তা লোকে লোকারণ্য শুধু মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। অনবরত মাইকে ঘোষণা করছে যাত্রী সুবিধার্তে গাড়ি প্রবেশ করবে না। রাখতে হবে অনেক দূরে পার্কিং জোনে। অগত্যা গাড়ি ছেড়ে চললাম হোটেলের সন্ধানে সাথে কিছু খাদ্যও চাই। কারণ আজ গাড়ি চলেছে প্রায় ৩৫০ কি.মি. যেখানে ২৬২ কি.মি. পথ অতিক্রম করলে ডারিংবাড়ি থেকে ফুলবনি হয়ে ব্রহ্মপুর পৌছানো যায় আমরা সে পথে না গিয়ে অতিরিক্ত কয়েকটি স্থানে ঘুরবো বলে ভিন্ন পথে ঘুরে ঘুরে এসেছি। তাই পথে সময় মত খাওয়া হয়ে ওঠেনি। এখন খিদে পেয়েছে ভীষণ। লক্ষ লোকের ভিড় ঠেলে গরম ভাতের হোটেল পাওয়া গেল। বিকাল ৫টায় গরম ভাত, ডাল, সব্জি খেয়ে বেড়িয়ে পড়লাম রাত্রি নিবাসের জন্য হোটেলের সন্ধানে। সমুদ্রের ধারে এই বিপুল জনসমাগমের হেতু কি জানতে শুনলাম ফি-বছর মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপি সমুদ্রপাড়ে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়, চলে গান-বাজনার অনুষ্ঠান। এবং আজই পড়েছে সেই বিশেষ দিনটি 'মকর সংক্রান্তি'। যাই হোক, সী বিচ-এর কাছেই হোটেল পাওয়া গেল। রুম চার্জ অন্য সময়ের থেকে অনেক বেশি। রাত ৯টার পর জনসমাগম দ্রুত কমতে লাগলো। এ সময় একটু সুযোগ পেলাম ৩৫ বছর আগে দেখা গোপালপুর-অন-সীকে যদি একটু খুঁজে পাই। সেই নির্জন গোপালপুরকে কোনও দিনই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পথের ধারে এখন দোকান আর হোটেলের ছড়াছড়ি, হৈ হট্টগোল, গাড়ির ধোঁয়ায় আধুনিক গোপালপুর যেন অন্য কথা বলতে চায়।

চিমনি থেকে ম্যানহোল

গৌতম রায়চৌধুরী

When my mother died I was very young,
And my father sold me while yet my tongue
Could scarcely cry "Weep!" "Weep!' 'Weep!' 'Weep!"
So your chimneys I sweep & in soot I sleep.

"দ্য চিমনি সুইপার" - ব্রিটিশ কবি উইলিয়ম ব্লেকের একটি বিখ্যাত কবিতা। দুটি ভাগে প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ এবং ১৭৯৪ সালে, তৎকালীন ব্রিটেনের বীভৎস শিশুশ্রমের বর্ণনা দিয়ে। শৈশবে মাতৃহীন শিশুটিকে হতদরিদ্র বাবা বিক্রি করে দিয়েছেন কারখানার মালিকের কাছে। আধুনিক শিল্পের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের বিশাল সব চিমনি। পরিষ্কার করার জন্য দরকার শিশু শ্রমিকদের। অর্ধনগ্ন শিশুগুলিকে ফেলে দেওয়া হতো চিমনির উপর থেকে, ভুসোকালি পরিষ্কার করার জন্য। পড়ে গিয়েই অনেকের মৃত্যু হতো। বেশির ভাগই ভুসোকালির রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় শৈশবেই মারা যেতো। সামান্য কয়েকজন দীর্ঘ জীবন পেতো, তবে তাদের সঙ্গী হতো শ্বাসজনিত রোগ। অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের শ্রমজীবি মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

উনবিংশ শতকের কোলকাতা। ভবানীপুরের এক মধ্যবিত্ত পাড়া। ১৯০৭ সালের কোনো একদিন নফরচন্দ্র কুণ্ডু নামক এক ব্যক্তি অফিস যাওয়ার পথে দেখলেন নর্দমার বিষাক্ত গ্যাসে দু'জন শ্রমিক ছটপট করছেন। সহৃদয় কুণ্ডুবাবু তাদের উদ্ধারের চেষ্টায় নর্দমায় নামলেন, কিন্তু আর উঠতে পারলেন

না। বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ হলো এবং জায়গাটার নামকরণ হলো 'নফর কুণ্ডু লেন', যা এখনও আছে। কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের বিখ্যাত কবিতা 'নফর কুণ্ডু'-তে তিনি অমর হয়ে আছেন।

২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। কোলকাতার কুঁদঘাট। ম্যানহোলে কাজ করতে গিয়ে মারা গেলেন মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার পূর্ব তালসের গ্রাম থেকে কাজ করতে আসা তিন ভাই- মহম্মদ আলমগীর (৩৫), জাহাঙ্গীর আলম (২২) এবং সাবির হোসেন (২০) ও তাদের প্রতিবেশী লিয়াকত আলি (২০)। এরা সবাই একটি ঠিকাদারি সংস্থার হয়ে কাজ করতো। সুতরাং কোলকাতা পুরসভার কোনো দায়িত্ব নেই। তাদের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি গত ৩১শে মার্চ, ২০২১ তারিখে জানিয়েছেন যে, ওই শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। এমনকি কোনও সুরক্ষা-কবচ ছাড়াই তারা ম্যানহোলে নেমেছিলো। তদন্ত কমিটি ঠিকাদার সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করার সুপারিশ করেছে।

তিনশো বছরের বেশি সময় ধরে শ্রমিকরা অবহেলিত, অত্যাচারিত। শিল্প বিপ্লব, সর্বোপরি ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে ইউরোপের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের অবস্থা তথৈবচ। ১৯০৭-এর নফর চন্দ্র কুণ্ডু থেকে ২০২১-এর আলমগীর ভাইরা- 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে বয়ে চলেছে।' অবস্থার উন্নতির বদলে অবনতি হয়েছে। এই মৃত্যুর পিছনে যে নির্মম অবহেলা তা নিয়ে পবিত্র ক্রোধ বা হা-হুতাশের কোনো অর্থ নেই। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমরা শহুরে মধ্যবিত্তরা আবারও জানতে পারি নিকাশি নালায় কাজে নামার আগে নানাবিধ নিরাপত্তা থাকা দরকার, যেমন গ্যাসমাস্ক, জমা জল বার করার জন্য পাম্প, অক্সিজেন চলাচলের জন্য ফ্যান, বাতাস পরীক্ষা করার জন্য 'এক্সপ্লোসিভ মিটার', অক্সিজেন সিলিন্ডার, দড়ি, সর্বোপরি পুরসভার কর্মী, ঠিকাদার এবং নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি। হতভাগ্যদের কোমরের দড়িটুকু পর্যন্ত জোটেনি। কোলকাতা পুরসভা, তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে এবং পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিয়েই দায়িত্ব পালন করেছে। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সেই 'পাঁচ লক্ষ' টাকা ঠিকাদার ফেরৎ দেবে পুরসভাকে। চারটি তাজা প্রাণ এভাবে চলে গেল কেন; সেটা কোনো প্রশ্নই নয়। আরও কেন যায় না, সেটাই বিস্ময়ের।

এই অবহেলার উল্টো দিকে আছে গরীব মানুষগুলির অসহায়তা। গ্রামে কাজ নেই, অতিমারীর ভয়ে অন্য রাজ্যে যাওয়া বন্ধ, ফলে একমাত্র ভরসা- কোলকাতা। কিন্তু এখানে কাজের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। অভিজ্ঞতা নেই, তাই যা পায় তাই করে। মজুরির বাঁধাধরা নিয়ম নেই। থাকলেও হাতে পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। যখন যা পায় বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। মোবাইলে মাঝে মাঝে ফোন করতে পারে। ২৫শে ফেব্রুয়ারি আলমগীর নালায় নামার আগে বাড়িতে ফোন করেছিলেন, লিয়াকত তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর শরীরের খবর নিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরই পরিবার জানতে পেরেছিলো তাঁরা কী কাজ করতো। এটা কিন্তু ব্যতিক্রম নয়, এটাই নিয়ম। গত বছর, করোনা-লকডাউনের সময় আমরা পরিযায়ীদের লঙমার্চ দেখে শিহরিত হয়েছিলাম।

পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত রেললাইনে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, ধাবমান ট্রেনের শব্দও শুনতে পায়নি। অসহায় হয়ে মৃত্যবরণ করেছিলো বা হাইওয়েতে হাঁটতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েছিলো, তখন রাষ্ট্র তাদেরই দোষী সাব্যস্ত করেছিলো। কারণ

রেললাইন বা 'ন্যাশনাল হাইওয়ে' গুলিতে হাঁটা আইনত নিষিদ্ধ। তেমনি ম্যানহোলে বিষাক্ত গ্যাসে মৃত আলমগীরদের হয়তো, সুরক্ষা বিধি অমান্য করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে। আদালত তো আইনের উর্দ্ধে যেতে পারবে না এবং আদালতের বিরুদ্ধে কিছু বলাও যাবে না।

মানুষ বিপর্যয় থেকেই শিক্ষা নেয়। ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়করা, কেন্দ্র, রাজ্য নির্বিশেষে, সে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবি মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নেই, কাজের সুস্থ নিরাপদ পরিবেশ ও পরিকাঠামো নেই, তাদের জন্য কোনো ভাবনা কী চোখে পড়ে? এক কথায় উত্তর-না। উপরন্তু অতিমারীর সুযোগে পুরোপুরি বিপরীত লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবি মানুষের জন্য যে সামান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্রিটিশ আমল থেকে চালু ছিলো, শ্রম-আইন 'সংস্কার'-এর জন্য বিল করিয়ে, তাও তুলে দেবার আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক শ্রমিকের জীবিকার যেটুকু নিরাপত্তা এখনও আছে, কর্মস্থলে স্বাস্থ্যহানি বা দুর্ঘটনা নিবারণের যেটুকু ব্যবস্থা আছে, সেটা চালু রাখার যেটুকু আইনী বাধ্যবাধকতা আছে, নব সংস্কারের ফলে বরবাদ হয়ে যাবে। 'অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস' আইনটি আগে যে সংস্থায় কর্মীর সংখ্যা ১০ (বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে) বা ২০-র (বিদ্যুৎ ব্যবহার না করলে) কম, সেখানে প্রযোজ্য হতো না। এই সীমারেখা যুক্তিহীন, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কিন্তু নতুন সংস্করণে সীমা কমানোর পরিবর্তে কর্মী-সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে যথাক্রমে ২০ ও ৪০। অর্থাৎ আরও বহু সংস্থা এখন আর বাধ্য থাকবে না। আইন থাকাকালীনই অধিকাংশ মালিক নিরাপত্তা বিধানের শর্তাবলী বেমালুম অস্বীকার করে, আর এখন তো পোয়াবারো। বোঝার উপর শাকের আঁটি, কোনো রাজ্যসরকার কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্বার্থে যেকোনো নতুন কারখানাকে এই আইন থেকে অব্যাহতি দিতে পারবে। সর্বোপরি, যে 'মে দিবস' সারা বিশ্বের শ্রমিকদের কাছে এক পবিত্র দিন হিসাবে পালিত হয়, তার তাৎপর্যটাও এই শ্রম-সংস্কারে হারিয়ে যেতে বসেছে। নতুন শ্রমবিধিতে মালিকরা ইচ্ছা করলেই ১২ ঘন্টা অবধি কাজ করাতে পারবেন।

উদার (?) অর্থনীতির প্রবক্তারা মনে করেন শ্রমের বাজার থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে বিনিয়োগ বাড়বে, শিল্পের প্রসার হবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদেরও আয় বৃদ্ধি পাবে। আমাদের মহান নেতা মোদিজী এবং তাঁর সভাসদরা এই মতে বিশ্বাসী। তবে এই বিনিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির প্রসার ঘটায় এমন কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদি তর্কের খাতিরে এই অদ্ভুত সমীকরণটা মেনেও নিই, তবুও শ্রমিকের প্রাণের বিনিময়ের এই উন্নয়ন কী কাম্য হতে পারে। আমাদের মন্ত্র 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'। কোথায় রইলো সবার বিকাশ? এতো উন্নয়নের গাজর দেখিয়ে পুঁজির হাতে সব কিছু তুলে দেওয়া। আমরা সবাই "গাধা" আমাদের এই নতুন রাজত্বে।

হ্যাঁ এটাই তাঁরা, কৃষি, শিল্প বা সেবা সবক্ষেত্রেই করছেন বা করতে চাইছেন। সারা ভারতের মিডিয়া ভয়ে বা লোভে তাদের কাছে মাথা মুড়িয়েছে। তাহলে উপায়? একমাত্র শ্রমজীবি মানুষ ও কৃষকের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ, সংগঠিত রাজনীতিই পারে এই সর্বনাশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। ক্রীতদাস প্রথা থেকে বর্তমানে শ্রমিক-কৃষকের অবস্থার উন্নতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই মতবাদের সত্যতা বোঝা যায়। অনেকেই হয়তো আমাদের দেশে গত শতাব্দীর

লাগামছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কথা উল্লেখ করবেন। শ্রমিকরা নিজেদের দাবী আদায়ে যতোটা সচেষ্ট ছিলেন, হয়তো সর্বদা দায়িত্ব পালনে ততোটা ছিলেন না। অনেকেই বিশ্বাস করতেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই শিল্পের ধ্বংসের মূল কারণ। কিন্তু কালের নিরিখে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে, মাথার উপর থেকে ছাতা সরে গেলে যেমন রোদের তেজ বোঝা যায় ট্রেড ইউনিয়ন দুর্বল হওয়ার পর বোঝা যাচ্ছে তার প্রয়োজনীয়তা। তাই একমাত্র সংগঠিত শ্রম-আন্দোলনই মুক্তির উপায়। নির্বাচনী প্রচারের নামে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে যে ভূতের নৃত্য চলছে, তাতে মৌলিক প্রশ্নগুলি ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে। জাত-ধর্ম-বহিরাগত প্রভৃতি অলীক-অবাস্তব ইস্যুতে কদর্য ভাষায় দুটি প্রধান প্রতিপক্ষ চীৎকার করে চলেছে। এরই মধ্যে জীবন-জীবিকা নিয়ে, মৌলিক প্রশ্নগুলি যারা তুলছে তাঁদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমকে ছোট করলে মস্ত অন্যায় হবে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগ্রামের পথই একমাত্র উপায়। তাই হতাশা নয়, অন্ধকারের মধ্যেও নানা নতুন সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের সময়।

২৬শে ফেব্রুয়ারি তিন সন্তানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তোরাব আলির প্রশ্ন ছিলো, "তিন ছেলেকে হারিয়ে আমরা কী নিয়ে বাঁচবো?" এই প্রশ্নের উত্তর হয়না। তবে ভবিষ্যতে তোরাব আলিদের যেন এই প্রশ্ন না করতে হয় সেটাই এই লড়াইয়ের লক্ষ্য।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস স্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - মঙ্গলবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Tapan Kumar Das on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph.: 9830933834 / 9674553477 and Printed at Monalisa Printers, D/26 Katjurnagar, Kolkata- 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata- 700 045, Editor- Tapan Kumar Das.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in